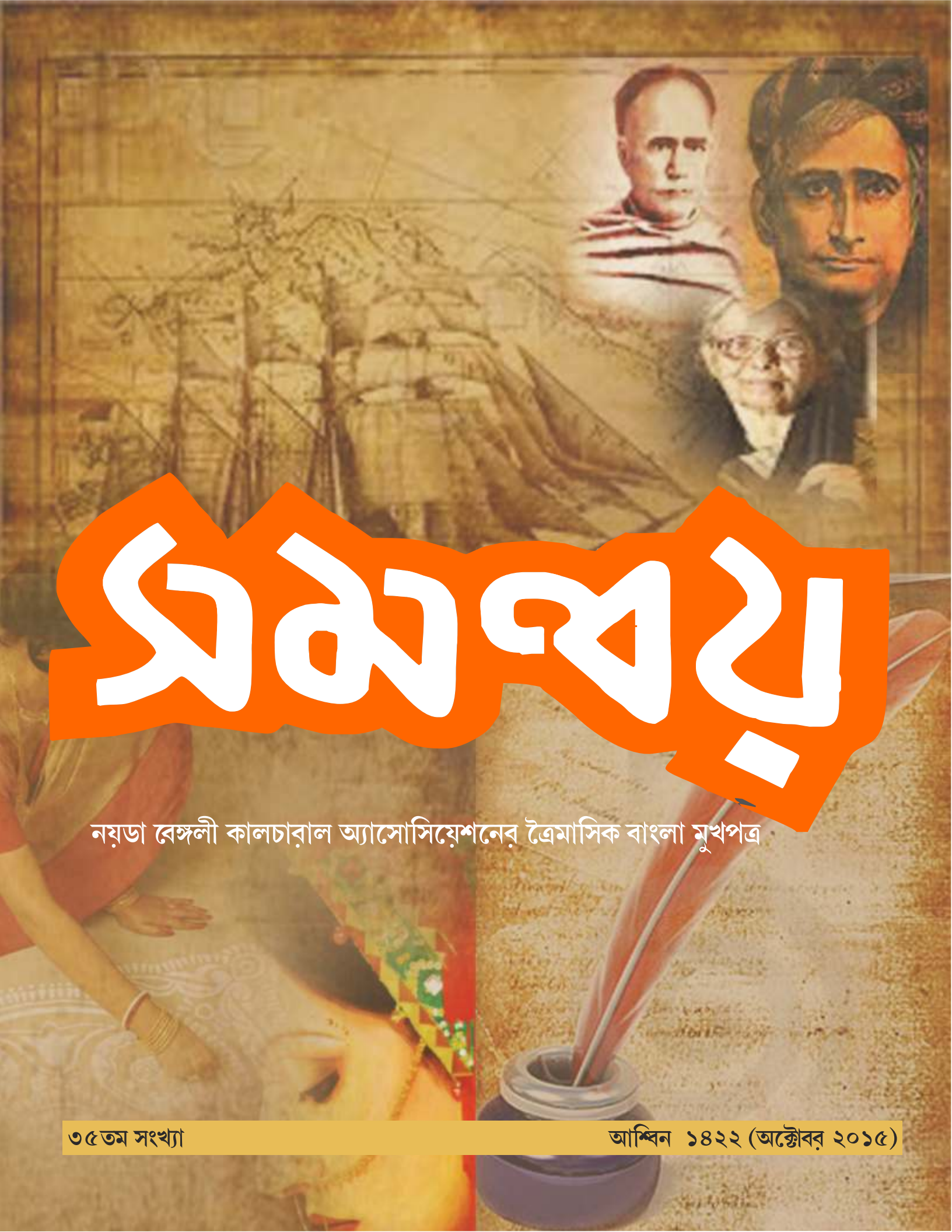

সমন্বয়

নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের ত্রৈমাসিক বাংলা মুখপত্র

৩৫তম সংখ্যা

আশ্বিন ১৪২২ (অক্টোবর ২০১৫)

সম্পাদকীয়

বর্ষা ঋতুর অবসান । ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে বর্ষা। শ্রাবণের মেঘের ঘনঘটা এখন অনেকটা স্থির হয়েছে — শোনা যায় না আর উড়ে যাওয়া চাতক পাখীর ডাক। প্রচণ্ড প্রখরিত ধরাতল এখন পূর্ণমাত্রায় স্নাত, ভোরবেলায় ঘাসের ডগায় জমে শিশির। বনে-উপবনে ফুটে ওঠে শিউলি-গোলাপ-বকুল-মল্লিকা-কামিনী-মাধবীর গুচ্ছ। বিলে-ঝিলে হাওয়ায় শরীর দুলিয়ে 'শাপলা' ফুলের গন্ধে ভরে ওঠে চারিপাশ। সুদূর নীল আকাশে ভেসে চলে মেঘের ভেলা... ভেসে চলে ওরা কোন দূর দেশে। মনটা ভরে ওঠে এক নতুন সজীবতায় - আর তখনই বোধহয় গাইতে ইচ্ছে করে।

শরত তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।
ছড়িয়ে গেল, ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরত, তোমার শিশির ধোয়া কুন্তলে —
বনেরপথে লুটিয়ে পরা অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।

এখনও তো ঝরে বৃষ্টি... হঠাৎ করে রৌদ্র্যভরা বনছায়ায় নেমে আসে বারিধারা... ঝম্‌ঝম্ করে । ধরার মানুষ যখন পূর্ণমাত্রায় বর্ষার প্রকোপ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইছে... গুটিয়ে রাখা, ভ্যাপসা গন্ধে ভরা শয্যাসামগ্রী ক্ষণিকের জ্বলে ওঠা রৌদ্র্যে শুকিয়ে নিতে ব্যস্ত... তখনই হঠাৎ নেমে আসে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ... আবার সবকিছু ঘরে তোলার হুড়োহুড়ি... মিনিটের মধ্যেই যখন আবার ফুটে ওঠে সোনাঝরা রদ্দুর তখনই মন থেকে বেড়িয়ে আসে একি সেই 'বৌ নাচানো বৃষ্টি'! কিন্তু শিউলি ফুলের মাদকতায় যখন ওরে ওঠে বৃষ্টিঝরা সকাল তখন আবার সেই মনভোলানো গানটি মনে পড়ে যায়।

'দেখো দেখো দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কি নারায়...
ডাক দিয়েছে রে ! শিউলি ফুলে রে...
আয় আয়... আয়...।

কবি নজরুল তাঁর অমর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন এই শরতের অসম্ভব চিত্ররূপময়তা —

"এসো শারদ প্রাতের পথিক
এসো শিউলি বিছানো পথে,
এসো ধুইয়া চরণ শিশিরে
এসো অরুণ কিরণ রথে
দলি শাপলা শামুক শতদল
এসো রাঙায়ে তোমার পদতল
নীল লাল ঝরায়ে ঢলঢল
এসো অরণ্য পর্বতে।

শহরের গণ্ডী ছাড়ালে তখনও জমে আছে জল খানায় ডোবায় .....থেকে থেকে শোনা যায় কোলা ব্যাঙের ডাক.. কঁ... কঁ... কঁ । জলে ভরা ক্ষেতে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে সবুজ ধানের শীষ। সমস্ত প্রান্তর জুড়ে সবুজের ছোঁয়া। কোথাও বা নদীর বুক ভরে উঠেছে কানায় কানায় জলে — উপছে পড়া সেই জলরাশি ভাসিয়ে দিচ্ছে গ্রামাঞ্চল, তারই মাঝে শরতের হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে সাদা কাশফুলের ঝাড়ি। কোথাও কোনো সুদূর অরণ্যপ্রান্ত পেখম মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ময়ূর, সন্ধ্যার আকাশে ফুটে উঠেছে রামধনুর দিগন্ত ছোঁয়া রেখা, ভেসে ওঠে মনের আকাশে ঢাকিদের ঢাক বাজানোর আওয়াজ। হয়তো তারা এখন পুরোনো ঢাকের খোল তেল মাখিয়ে মসৃণ করে নিচ্ছে... বেতের ছড়িগুলো গুছিয়ে তাদের বাজনার সুর মিলিয়ে... ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার সময় এসে গেছে তাদের। ঢাকের বাজনায় তারা শোনাবে এই ধরার মানুষকে আগমনীর গান... দিকে দিকে বেজেউঠবে মা দুর্গার বন্দনা।

তাঁরও তো পিতৃগৃহে আসার সময় হয়েছে। তিনি তো সকলের মা জননী! বছরে একবার আসেন এই ধরায় তাঁর ঘরের লক্ষ্মীকে বিরাজমান করতে, আজ এই শরতের আগমনে সমস্ত ধরাবাসী মেতে উঠেছে তাঁরই আগমনী গানের সুরে...

আসুন আমরা আজ মন ভরে আনন্দ নিই। সমস্ত দুঃখ-গ্লানি... ভেদাভেদ ভুলে একসাথে মায়ের বন্দনায় মেতে উঠি।

বাজে ওই আগমনী গান
ঝরে শেফালী, দোলে কাশের গুচ্ছ
মধুর বায়ে হল উতলা পরাণ
শুভ্র মেঘের ভেলা সুনীল আকাশে
ধানের মঞ্জরী দোলে বাতাসে,
পুলকে জেগে ওঠে আনন্দ তান।
শারদ অঞ্জলি বাঁশীর সুরে
আনে আশার বাণী হৃদয় জুড়ে
শিশির ভেজা ধানে ঝরা মালতী
আসিবে ঘরে চির চেনা অতিথী
বনে মর্মরে শুনি তারি আহ্বান।

আরতি

সনাতন মুখার্জী, দূর্গাবাড়ী, দিল্লী

রতি শব্দের অর্থ - মিলন সুখ বা আনন্দ। যে কর্মের দ্বারা বিশেষ সুখ বা আনন্দের অনুভূতি হয় তাকেই আরতি বলা হয়। যে কোন কর্মের শেষে হয় আনন্দ অনুভূতি। সেই জন্য প্রত্যেক শুভ কর্মের শেষে আরতির ব্যবস্থা। গৃহস্থ জীবনের শুরুতে বর বিয়ে করে বধূকে বাড়িতে নিয়ে এলে বধূকে আরতি করে বরণ করে ঘরে তোলা হয়। যে কোন বিশেষ ভাল কাজ করে ফিরে এলে তাকে আরতি করে সম্মান জানানো হয়।

প্রত্যেক দেব-দেবীর পুজোর শেষে আরতির ব্যবস্থা আছে। এই আরতিকে নীরাজনও বলা হয়। পুজোতে যে সকল দোষ ত্রুটি থাকে তার পূর্ণতার জন্য আরতির ব্যবস্থা, আরতির সময় ভক্তজন দীনার্ত চিত্তে দেবতার স্তুতিগান করেন। স্তুতিগান করতে করতে ভক্তহৃদয় ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কখনো অশ্রুবারি ঝরতে, কখনো ক্রন্দন করতে, আবার কাউকে ভাবে মুর্চ্ছা হতেও দেখা যায়। এগুলি নির্ভর করছে কে কতটা দেবতার ভাবে একাত্ম হতে পারল তার উপর।

আরতির অনেক উপাচার আছে। সাধারণত আমাদের এই শরীর পঞ্চভূত নিয়ে গঠিত। তাই পঞ্চভূতের প্রতীক দ্বারাই আরতি প্রাধান্য পায়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত হল প্রাণের পোষক।

সূর্য অর্থাৎ তাপ হচ্ছে প্রাণের প্রকাশক। সেই জন্য প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা আরতি করা হয়। আরতির ভঙ্গিমা হচ্ছে বাম পাদ অগ্রে রেখে বাম হাতে ঘন্টাধ্বনি করতে করতে পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা আরাধ্য দেবদেবীর পদতলে ৪ বার, বক্ষস্থলে ২ বার মুখমণ্ডলে ৩ বার, সর্ব্বাঙ্গে ৭ বার বামাবর্তে ভ্রমিত করতে করতে আরতি করার বিধান। ৪+২+৩+৭ = ১৬। এই ষোল বার কেন? আরতি অর্থে সমর্পণ, ভক্ত তাঁর আরাধ্য দেবদেবীকে সমস্ত কিছু সমর্পন করছেন। এই পঞ্চভূত তোমাকে সমর্পন করলাম। আমার পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তোমাকে সমর্পন করলাম। আমার মনও তোমাকে দিয়ে দিলাম। এইভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দেওয়া। নিজেকে বিলিন করে দেওয়া।

আরতির শেষে পশ্চাৎ বাগে দর্শকদের উদ্দেশ্যে এই আলোক শিখা দেখানো হয়। ভক্তরা এই আরতি গ্রহণ করেন। পঞ্চ প্রদীপ হল পঞ্চ অগ্নির প্রতীক। ভূতাগ্নি - সূর্য, জঠরাগ্নি - পেটে, জ্ঞানাগ্নি - বুদ্ধিতে, তত্ত্বাগ্নি - চিন্তাতে, বিবেকাগ্নি - আধ্যাত্মতে। এই অগ্নির প্রকাশ চোখে। সেইজন্য ভক্তপ্রাণগণ দূর থেকে এই অগ্নির শিখা নিজ মস্তকে চক্ষে ও বক্ষস্থলে স্পর্শ করেন। একশত বৎসর সুস্থ জীবন ধারণের প্রার্থনা করেন।

অপ অর্থাৎ জল হচ্ছে প্রাণের বিকাশকে। সেইজন্য শঙ্খে জলপূর্ণ করে পূর্বক্রম অনুসারে দেবতার আরতি করা হয়।

এতে শক্তি ও তেজ বৃদ্ধির প্রার্থনা করা হয়।

এরপর বস্ত্রদ্বারা আরতি করা হয়। বস্ত্র হচ্ছে আকাশের প্রতীক। তার পর পল্লবদ্বারা । পল্লব দিকচক্রবালের প্রতীক। এরপর ধূপবাতি ও চামর দ্বারা আরতি করা হয়। চামর বাতাসের প্রতীক।

শঙ্খ ঘন্টা মৃদঙ্গ বংশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা নানা প্রকার শব্দ সৃষ্টি করা হয়। এই শব্দ ব্রহ্মাণ্ডে আছে এবং আমাদের দেহ পিণ্ডের মধ্যেও আছে। বাহিরের এই ধ্বনি দ্বারা আমাদের দেহ অভ্যন্তরের ধ্বনিগুলিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়। সেইজন্য সুর ছন্দ তাল মাত্রার সাথে সাথে দেহ ও মন হিল্লোলিত হয়ে উঠে। এক প্রকার মাদকতার সৃষ্টি করে, এই শব্দ দ্বারা অশুভ শক্তির নাশ ও শুভ শক্তির প্রকাশ ঘটে।

আরতির পর প্রণাম। বিরাটের কাছে নিজেকে নত করা। দম্ভ অহংকারের বিনাশ ঘটিয়ে শিশুর সরলতা নিয়ে তাঁর সাথে এক হওয়া।

মা দুর্গার আবাহন

কৃষ্ণা দাশগুপ্ত

প্রতিমা তৈরি শেষ। মাটির শেষ প্রলেপটুকুও শুকিয়ে এসেছে অনেকটা। আজকালের মধ্যেই বাহারি রঙ চড়বে প্রতিমার গায়ে। নিপুণ শিল্পী তার তুলির আলতো ছোঁয়ায় জাগিয়ে তুলবেন মা দুর্গাকে

আশ্বিনের শারদ প্রাতে
দিকে দিকে বেজে উঠেছে শঙ্খধ্বনি
নির্মল মেঘমুক্ত শরতের শুভ্র নীলাকাশ
বাতাসে ছড়ানো শিউলি ফুলের সুবাস।
নদীর ধারে সাদা কাশফুলের বনে,
মৃদুমন্দ সমীরণ সানন্দে ঘোষণা করে
আনন্দময়ী দেবী মহামায়ার
আগমনবার্তা। দেবী আসছেন
কৈলাস থেকে মর্ত্তদামে
ত্রিনয়নী দেবীদুর্গা
দশভূজা দশপ্রহরণ ধারিণী
মহিষাসুরমর্দিনী মা আদ্যাশক্তি মহামায়া।

শরৎকালের দুর্গাপূজার একটি প্রাচীন গল্প প্রচলিত আছে হিউয়েন সাংকে নিয়ে। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কোনো এক সময়ে শরৎকালে গঙ্গাপথে চলেছিলেন এই চীনা ´টক।পথে পড়লেন দস্যুর কবলে। দস্যুরা তাঁকে দেবী দুর্গার সামনে বলি দেবার জন্য ধরে নিয়ে চলল, বলির আয়োজন সারা। এমন সময় শ্রাবণের উড়ে আসা ঝড় ছুটে এল আশ্বিনের আঙিনায়। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সব আয়োজন। দস্যুরা মাথা বাঁচাতে যে যেদিকে পারল দিল ছুট। সেই সুযোগে নিজেকে মুক্ত করে পালালনে হিউয়েন সাঙ।

বাংলার অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপূজা হল বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মন্দিরের পুজোর জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকেই দুর্গাপূজা হয়েছে বাঙালির জাতীয় উৎসব। প্রাচীন কাল থেকেই প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধু মহেঞ্জোদারোতে দেবীর পূজা হত। ষোড়শো শতকে রাজশাহী অঞ্চলের রাজা কংসনারায়ণ দুর্গাপূজা করেন। অষ্টাদশ শতকে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দুর্গাপূজা করেন।

দুর্গাপূজার ইতিহাস বেশ পুরানো। সৃষ্টির আদিতে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের আদি 'বৃন্দাবনের মহারাসমণ্ডলে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। দ্বিতীয়বার দুর্গার আরাধনা করেন ব্রহ্মা। মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয়ের নিধনে তিনি শরণাপন্ন মহাদেব তৃতীয়বার দুর্গাপূজা করেছিলেন। এরপর দুর্বাসা মুনির শাপে লক্ষ্মীকে হারিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র চতুর্থবার দুর্গাপূজা করেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু পৃথিবীর শাসনভার পেয়ে ক্ষীরোদসাগরের তীরে মৃন্ময়ী মূর্তি বানিয়ে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। কার্তাবির্জাজ্জন বধের জন্য বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম দুর্গার আরাধনা করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে শ্রীকৃষ্ণের রাজত্বকালে দ্বারকানগরীতে কুলদেবী হিসেবে দেবী দুর্গা পূজিত হতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডব পক্ষের অর্জুন ও প্রছন্ন দুর্গাদেবীর পূজা করেছিলেন। রাজা সুরথ বসন্তকালে এই পূজার আয়োজন করেন, দেবীর এই পুজোকে বাসন্তি পূজাও বলা হয়। কিন্তু রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধার করতে যাওয়ার আগে শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন শরতকালে। তাই হিন্দুধর্মে এই পূজাতেক অকালবোধন বলা হয়। অধর্মের উপর ধর্মের জয়। এই চিন্তাধারাতেই পরবর্তীকালে শারদীয়া দুর্গোৎসব হিসেবে পালন করা হয় এই অকালবোধন পুজাকে।

একই সঙ্গে বহুরূপে মা দুর্গার। হিমালয় পর্বতের কন্যা বলে তাঁর এক নাম পার্বতী। আসলে পার্বতি নামটি হিমালয় পর্বতের কন্যা বলে বলা হত। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল উমা - হিমালয় (হিমবৎ - মেনকার মেনা) গর্ভজাত কন্যা ছিলেন উমা। ওনাদের দুই কন্যা ছিলেন উমার বড়বোনের নাম ছিল নদী শ্রেষ্ঠা গঙ্গা। মা দুর্গা সারা ভুমণ্ডলের অন্নদায়িনী তাই তিনিই অন্নপূর্ণা। স্যার চন্দ্রমার তাঁর এডোনিস গ্রন্থে প্রাচ্যের এক বৃষভবাহন দেবতা ও সিংহবাহিনী দেবীর উল্লেখ করেছেন। এই দেব-দেবীই আদতে আমাদের হরগৌরী। A short history of religion গ্রন্থে বোনদিয়া (Bona Dea) নামক এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যিনি A desty of fertility অর্থাৎ পস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে প্রচলিতা এবং এই বোনদিয়া আমাদের সুন্দরবনের বনদুর্গা বা বনবিধি। এছাড়া মহিষাসুরমর্দিনী, কাত্যায়নী, শিবানী, ভবানি, আদ্যাশক্তি, চণ্ডী এইসব নামেই মা দুর্গা বাংলার মানুষের কাছে পূজিত হন। নেপালে দেবী নরকা, কাশ্মীরে অম্বা, গুজরাটে হিঙ্গলা বা রুদ্রাণী, রাজস্থানে কল্যাণী, দক্ষিণে অম্বিকা, বিহারে উমা নামে তিনি পূজিতা গ্রাম বাংলায় পূজিতা দেবী শীতলা, মনসা, বাশুলি, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী সকলেই মা দুর্গার অংশ।

অনাবৃষ্টির সঙ্কটে পৃথিবী যখন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে তখন ঋষিদের স্তবে তুষ্ট হয়ে শক্তিময়ী দেবী নিজের দেহ থেকে উৎপন্ন শাকসব্জীর দ্বারা বিশ্ববাসীর প্রতিপালনে সচেষ্ট হন। সেই পাক্ ভক্ষণ করে মানুষ প্রাণ ফিরে পায় তাই দেবীর আর এক নাম

পাকম্ভরী দেবী। যতদিন না পর্যন্ত বৃষ্টি হয় ততদিন সমগ্র বিশ্বের মানুষকে দেবী নয়রকম পাক্ খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এই কাহিনীর বর্ণনা লিখিত আছে রাজস্থানের আজমীরের কাছে পাকম্ভরী তীর্থে। আমাদের বাংলায় কাটোয়ার কাছে মঙ্গলকোট থানার মাজিগ্রামে পাকম্ভরী দেবীর পূজা হয়।

মহালয়ার সুপ্রভাতে নবরাত্রির শুরু। মা দুর্গা এইসময় প্রতিপদ তিথি থেকে নবমী তিথি অবধি মোট নয়দিন নয়টি রূপ ধারণ করেন। পিতামহ ব্রহ্মা দেবীর এই নয়টি রূপের নামকরণ করেছিলেন। এরা প্রত্যেকেই দেবীর নয়টি কায়াব্যূহ মূর্তি নবদুর্গা নামে পরিচিত। নবদুর্গার এই নয়টি নাম হল, শৈলপুত্রী (পর্বতের কন্যা), ব্রহ্মচারিণী (যিনি ব্রহ্মাকে স্বয়ং জ্ঞান দান করেন) চন্দ্রঘন্টা (দেবী দুর্গার মহষাসুর বধের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রর প্রদত্ত ঘন্টা, যার মধ্যে গজরাজ ঐরাবতের মহাশক্তি নিহিত ছিল), কুষ্মাণ্ডা (দুর্বিষ ত্রিতাস হল কুষ্মা, আর যিনি এই তিতাশ নিজের উদরে ধারণ করেন) স্কন্দমাতা (দেব সেনাপতি কার্তিকের বা স্কন্দের মাতা) কাত্যায়নী (ঋষি কাত্যায়নের কন্যা) অন্য মতে ঋষি কাত্যায়ন প্রথম মা দুর্গার পূজা করেন,তাই তিনি কাত্যায়নী নামে অভিহিত) কালরাত্রি (প্রলয়কালে এই রাত্রিরূপিনি মাতার কোলেই বিলয় হয় বিশ্বর), দেবী যোগনিদ্রা (মহাকালিকা বা কালরাত্রি নামে আখ্যাত), মহাগৌরী (সন্তানবৎসলা, শিব সোহাগিনী, বিদ্যুৎবর্ণা মা দুর্গার প্রসন্ন মূর্তি) এবং সিদ্ধিদাত্রী (যিনি যোগমায়া মাহেশ্বরী, সল কাজে সিদ্ধি প্রদান করেন) দক্ষযজ্ঞের প্রলয়ের কারণে দক্ষকন্যা সতীর অপর নাম দাক্ষায়নী, বেদেতেও মা দুর্গার সাতটি নাম দেওয়া আছে। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেবীকবচে একাদশ নামের উল্লেখ আছে মা দুর্গার। এ ছাড়াও দুর্গাপূজার পর বিজয়াদশমীতে অপরাজিতা পূজা হয়। এই অপরাজিতা দেবী দুর্গার চৌষট্টি যোগিনীদের মধ্যে অন্যতমা এবং মা দুর্গার সাথে এক ও অভিন্ন। দেবী দুর্গার সন্ধিপূজায় দেবীর চামুণ্ডারূপের পূজা হয়। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার সবচেয়ে রুদ্ররূপ, যেখানে তিনি একাধারে দশুমদলনী আবার অন্যদিকে কল্যাণী এবং বরাভয়দায়িনী। আসলে বিশ্বমাতা মা দুর্গা এই সকল রূপের সমষ্টি মূর্তি।

মহালয়ার চণ্ডীপাঠে আমরা দেবীকে বিভিন্ন রূপে আবাহন করি। আমরা আবাহন করি মা দুর্গাকে শক্তিরূপে। সকল অশুভ শক্তির উত্থানে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার প্রাক্কালেই সমৃ্টি শুভ শক্তি অশুভ শক্তিকে পরাভব করুক। আনন্দাধারা প্রবাহিত হোক ভূবনে। দুর্গম নামক অসুরকে নাশ করে দুরধিগমা অশান্তিকে নাশ করেছেন বলেই তিনি দুর্গা। তিনি দুর্গস্বরূপ। দুর্গে থেকে যুদ্ধ করলে যেমন নির্ভিকভাবে মোকাবিলা করা যায় সকল শত্রুর। তেমনি মা দুর্গার চরণাশ্রয়ে থেকে সংসার সমরে অবশ্যম্ভাবী বিজয়ী হওয়া যায়। তাইতো তাঁর আবাহন অর্চনায় বলা হয় যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈই, নমস্তস্যই, নমস্তস্যই নমো নমঃ।

মায়ের আবাহনেই ঘুরে ফিরে আসে মহালয়া। পূজার গন্ধ নিয়ে আসে মহালয়া। সমগ্র বাঙালি সমাজ তথা হিন্দু সমাজের একটি বর্ণাঢ্য উৎসব। মা দুর্গার এই আবাহন আজ ছড়িয়ে গেছে সমগ্র বিশ্ব। মা দুর্গর আবাহনে এই সার্বজনীন দুর্গোৎসব কখন থেকে শুরু হয়েছে অনুসন্ধানে জা যায় ১৭৯০ সালে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামের বারজন বন্ধুর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম বারোয়ারী দুর্গাপূজা শুরু হয়। বারোজন বন্ধু মিলে এই পূজার আয়োজন করেছিল বলেই পূজার নাম হয়েছিল 'বারোয়ারী' পূজা। পরবর্তীকালে বৃহৎ আকারে সর্বপ্রথম এই বারোয়ারি পূজা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৩২ সালে কাশিমবাজারের রামা হরিনাথ মহাশয়ের উদ্যোক্তায়। এর আগে তিনি দুর্গাপূজা আয়োজন করতেন ঘরোয়াভাবে তাঁর পৈতৃকবাড়ি মুর্শিদাবাদে। ১৯১০ সালে এই বারোয়ারি পূজা সার্বজনীন পূজার রূপ নেয় যখন 'সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা', সর্বসাধারমের কাছ থেকে চাঁদা তুলে কলকাতার বাগবজারে র্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন দুর্গাপূজার এই সার্বজনীন আয়োজন খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এক সময় সার্বজনীন শারদীয়া দুর্গোৎসব হিসেবে বাংলা ংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

দশদিনের এই সার্বজনীন দুর্গোৎসব মহালয়াতে শুরু হয়, মহালয়াতে দেবী দুর্গাকে পিত্রালয়ে আহবান করা হয়। প্রাণহীন মাটির মূর্তিকে পঞ্চমীর রাত্রে কুমোরটুলির সূক্ষ্মটানে 'দৃষ্টিদান' করা হয় এরপর শুরু হয় 'কল্পারম্ভ', 'বোধন, 'আমন্ত্রণ ' এবং অধিবাস। মহাসপ্তমীর সকালে নয় ধরণের বৃক্ষচারা পূজার মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতীকী পূজা করা হয় প্রকৃতি হচ্ছে দেবীর আর এক রূপ। মহাষ্টমীর দিন কুমারী পূজা করা হয়, যেখানে বালিকাকে দেবী দুর্গারূপে আরাধানা করা হয়। মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধিপূজা করা হয়। মহিষাসুর বধযুদ্ধে সন্ধির এই ক্ষণেই দেবী দুর্গা চামুণ্ডা বা কালীমূর্তির রূপ ধারণ করেছিলেন। মহানবমীর পূজায় মা দুর্গাকে শান্তির দেবী রূপে আরাধনা করা হয়। মতৃারূপে তিনি সমস্ত বিশ্বসংসারে শান্ত প্রতিষ্ঠা করেন। ঘরে ঘরে শান্তি বিরাম করুক - এই কামনাতেই মায়ের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়। পূজার দশম দিন মা দুর্গাকে সপরিবারে বিদায় দেবারপলা। মঙ্গলঘাটের জলে দেবীকে প্রতীকী বিসর্জন দেয়া হয়। নতুন করে শুরু হয় মা

দুর্গাকে আবার আবাহনের প্রতীক্ষা। এইভাবেই চলে আসছে মা দুর্গার আবাহন।

দুর্গাপূজা হল অশুভ, অন্যায়, পাপ, পঙ্কিলতার বিরুদ্ধে ন্যায় পূণ্য, সত্য, শুভ ও সুন্দরের যুদ্ধ। দুর্গতি থেকে রক্ষা, বিভেদ, বিবাদ, অনৈক্য, সাম্প্রদায়িকতা, ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ ও সংকীর্মতা প্রভৃতি ঊর্দ্ধে ওঠার জন্য মহাশক্তির বরলাভের মিমিত্তে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মেতে ওঠেন দেবী বন্দনায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সকলকে আহ্বান করে তিনি গেয়ে উঠেছিলেন

শস্যখেতের সোনার গানে

যোগ দেরে আজ সমান তানে

ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলাধারে

যে এসেছে তাহার মুখে

দেখ রে চেয়ে গভীর মুখে,

দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে যারে।

শরত আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে

আনন্দগান গাবে হৃদয়,

আনন্দ গান গারে...

মা দর্গুার আবাহনে মহালয়ার ভোরে সেই মন্ত্রই উচ্চারিত হয়ে আসছে সুগন্ধিত ধূপের গন্ধে।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপণে সংস্থিতাঃ।
নমস্তস্যই নমস্তস্যই নমস্তস্যই নমো নমঃ।।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতাঃ।
নমস্তস্যই নমস্তস্যই নমস্তস্যই নমো নমঃ।।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতাঃ।
নমস্তস্যই নমস্তস্যই নমস্তস্যই নমো নমঃ।।

এই সংখ্যার ধাঁধা

উইকিপেডিয়া থেকে জানা যায় যে আধুনিক সুডোকুর জন্মদাতা হলেন Howard Garns। ইনি একজন ৭৪ বছরের অবসর প্রাপ্ত architect ছিলেন। ইনি ধাঁধা তৈরি করতেন এবং ১৯৭৯ সালে তাঁর প্রথম সুডোকু ধাঁধা ছাপা হয় Dells ম্যাগজিনে। জাপানে সুডোকু ধাঁধা প্রথম বার ছাপা হয় ১৯৮৪ সালে Nicoli দ্বারা। জাপানিতে এই ধাঁধাটির নামকরণ হয় Suji wa dokushin ni kagiru যার অর্থ 'সংখ্যাটি একা আসতে হবে' অথবা 'সংখ্যাটি মাত্র একবার আসতে পারে', জাপানিতে dokushin কথাটির অর্থ অবিবাহিত লোক।

আপনাদের প্রিয় পত্রিকা সমন্বয় এবার থেকে প্রতেকবার একটি করে sudoku ধাঁধা ছাপাবে। প্রথম তিনজন যাঁরা এই ধাঁধার সঠিক উত্তর দেবেন তাঁদের নাম ও ধাঁধার সঠিক উত্তর আগামী সংখ্যায় ছাপানো হবে। দয়া করে কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম-এর সাহায্য নেবেন না।

আপনাদের জন্য রইল আমাদের শুভকামনা।

2				3					8		
					1			9	7	2	
7	8			2				6			
	5	4		7							
1										7	
						5		4	1		
		2				3			5	9	
5	3	6			9						
	7					4				3	

শোক বার্তা

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর রাত্রে আমাদের সঙ্ঘের বর্তমান সহ-সভাপতি শ্রী নীলাদ্রি দুয়ারির মাতা শ্রীযুক্তা আশালতা দুয়ারি স্বজ্ঞানে, তাঁর বাসভবন মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে, সকল পার্থিব মায়া কাটিয়ে পরলোক গমন করেছেন। আমরা তাঁর স্বর্গত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

সাহিত্যের মেরু বন্ধন

সমৃদ্ধ দত্ত

একজন লেখককের কাছে সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন — পাঠক কী চায়? কিন্তু আমাদের প্রশ্ন পাঠক কী চায় সেটা আন্দাজ করে যাঁরা সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করেন তাঁদের কী আদৌ মৌলিক সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত? আর সর্বোপরি পাঠক কী চায় এই প্রশ্নের আদৌ কোনও উত্তর হয় না। পাঠক মানে তো একটি গোষ্ঠী, একটি বয়স, একমুখী মানসিকতা অথবা সমাজের কোনও বিশেষ স্তরের প্রতিনিধি নয়। পাঠক আক্ষরিক অর্থেই সর্বজনীন। তিনি অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে পারেন। হতে পারেন নাসা-র বিজ্ঞানী। ১৫ বছরের কিশোর আর ষাটোর্ধ প্রৌঢ়ার মানসিক গঠন কীভাবে এক হবে! কৃষক পরিবারের দিন গুজরানের গল্পে বীজ বপন কিংবা সার সংগ্রহের সমস্যার বিস্তারিত বর্ণনায় কোনও পাঠক একাত্ম বোধ করেন, কেউ নতুন তথ্য পাওয়ার বিস্ময়ে উজ্জ্বল হন, আবার কেউ ওইসব বিবরণ পাঠে নিতান্তই অনাগ্রহী থাকেন। পাশাপাশি বইমেলার স্টলে দাঁড়িয়ে কেনা একটি বই বাড়ি ফিরে পড়ার পর বিভিন্ন পাঠকের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়। কেউ মাঝপথেই পড়া ছেড়ে দেন। কেউ এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ লাইনটির পর বলে ওঠেন—বাঃ। আবার কেউ এক সপ্তাহ ধরে পড়ার পর লেখকের বাপান্ত করেন। সুতরাং পাঠক কী চায় এই প্রশ্ন অবান্তর। আর তাই প্রাতঃস্মরণীয় লেখকরা কোনদিনই পাঠক কী চায় তা আচ করে লেখার চেষ্টা করেননি বা করেন না। কারণ তাহলে টেলিভিশনের মেগা ধারাবাহিকে চিত্রনাট্য রচয়িতার সঙ্গে সাহিত্যিকের কোন ও তফাৎ থাকে না। লেখক আর পাঠকের সম্পর্কের রসায়ন কেমন? আমার মনে হয় লেখক আর পাঠকের মধ্যে কোনও সম্পর্ক তৈরি হয় না। কারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে দুই ব্যক্তির মননের ভাললাগা, মন্দলাগার হাত ধরে। কিন্তু পাঠকের মননের সন্ধান পাওয়াতো দূরের কথা, লেখক তো পাঠকদের চোখেই দেখেন না। হ্যাঁ, ওরকম সংবর্ধনা সভা অথবা টিভি চ্যানেলের লাইভ প্রশ্নোত্তরে পাঠকের মুখোমুখি জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রকৃত পাঠকের হৃদয়ের উপলব্ধি টের পাওয়া সম্ভবপর নয়। আর বই কত বিক্রি হল তা সর্বদা পাঠকের নাড়িস্পন্দনের দিকনির্দেশ করে না। সুতরাং লেখকদের সারাজীবনের গভীর অন্বেষ হয়তো বা পাঠকের অন্তরে উঁকি মেরে দেখার প্রয়াস। অন্যদিকে লেখকের মানসলোক স্পর্শ করা গিয়েছে বলে পাঠকের অনুভব অথবাদাবি অনায়াসলভ্য। যার সারবত্তা কতটা তা অবশ্যই তর্কযোগ্য। কিন্তু তবুও একজন লেখকের সৃষ্টির সঙ্গে আলাপ যখন ক্রমে পরিচিতির গণ্ডিতে উত্তীর্ণ হয় তখন ব্যক্তিটিকে চিনতে না পারি, তাঁর জীবন দর্শন কী কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যায় না! একজন জনপ্রিয় লেখকের কোনও লেখা যে তাঁরই কলমনিঃসৃত তা নিমেষেই বুঝে ওঠা মোটেই কঠিন নয়। স্কুলের শেষপর্বে প্রতি বছর শারদীয়া সংখ্যার পত্রিকাগুলি প্রকাশের পর আমাদের কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে একটি লেখা খুবই মনোগ্রাহী ছিল। পত্রিকার যে কোনও একটি পাতা উল্টে স্রেফ লেখার অংশবিশেষ পড়েই বলে দিতে হবে এটা কোন লেখকের লেখা। একথা মোটেই অথিশয়োক্তি নয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের অনুমান মিলে যেত। এটা বিরাট কোনও কৃতিত্ব তা নয়। তবে আমাদের ওই বালখিল্যসুলভ সাফল্যের মধ্যেও যেন লেখককুলের একটি ব্যর্থতা ফুটে উঠত। তা হল ওই লেখকদের লেখার ধাঁচ, শব্দচয়ন, স্টাইল সবই পাঠকের পরিচিত হয়ে উঠেছে। বিষয়বৈচিত্রে হয়তো তিনি চমক দিতে পারেন, ফর্ম পাঠকের কাছে অতি চেনা। কেউ বলবেন এটা ব্যর্থতা হবে কেন? এটাই তো সাফল্য! তিনি বা তাঁরা নিজেদের একটা স্বকীয়তা গড়ে নিতে পেরেছেন। কোন মতটা ঠিক?

লেখক-পাঠকের সম্পর্ক তবু গড়ে ওঠে। হয়তো পাঠকের দিক থেকেই সেই গড়ে ওঠা। তবে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার মাধ্যম এখন আর শুধু লেখকের নিজের সৃষ্টি নয়, তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতিও এখন জোরদার। কারণ প্রচার মাধ্যমের বিস্ফোরণ। 'ইচ্ছামতী' আর 'চাঁদের পাহাড়ের' লেখক একই ব্যক্তি ভেবে পাঠক শিহরিত হয়েছেন। সেই অসামান্য প্রতিভাকে কোনদিন চোখে না দেখে তাঁর মানসিক মাপটি পাঠকের অন্দরে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। কিন্তু আজ তো স্রেফ নিভৃত কোণে নীরবে সাহিত্যসৃষ্টির যুগ নয়। একটি অথবা দুটি উপন্যাস বা কবিতা জনপ্রিয় হলেই তিনি তুমুল কোলাহলে হাজির হয়ে যাচ্ছেন বইমেলার লেখক-পাঠক মুখোমুখির আসর, অথবা টিভি চ্যানেলের আধঘন্টার সাক্ষাৎকার ভিত্তিক অনুষ্ঠানে। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের বোমাবর্ষণ কিংবা দেশে সাক্ষরতাবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা-তাবৎ ইস্যুতে মতামত প্রতিনিয়ত পাঠকের সামনে হাজির হতে থাকলে তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সতীনাথ ভাদুড়িদের সম্পর্কে হৃদয়ের গভীরে তৈরি হওয়া সম্ভ্রম কতটা রক্ষিত হত বলা শক্ত। আমি সেই দলে যারা বিশ্বাস করেন পাঠক আর লেখকের মধ্যে দূরত্বের প্রয়োজন। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা উচিত লেখকদের একটু আবডালে থেকে যাওয়াটা সাহিত্যের

রসস্বাদনের জন্যই প্রয়োজন। যা বলার তা তো তিনি লেখাতেই বলতে পারেন। সেটা গ্রহণ বা বর্জন পাঠকের হাতে। পাঠক গ্রহণ করল অথবা করল না সেটা জানাও বোধ করি খুব জরুরি নয়। কারণ সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে পাঠকের মতামত জেনে কী পরবর্তী সময়ে তিনি লেখার বিষয় অথবা অবয়ব নির্মাণ করবেন। তাহলে যে সাহিত্যের অপমৃত্যু। তাহলে কী পাঠকের কোনও প্রশ্ন অথবা অভিমত লেখক পর্যন্ত পৌঁছবে না? তা কেন? লেখক-পাঠক সেতু তৈরির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা-চিঠি লেখা। অলি-কে ভুলে গিয়ে শর্মিলাকে বিয়ে করে অতীন সম্পূর্ণ অন্যায় করেছে — সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে কোনও পাঠক যদি এই মর্মে অনুযোগ জানান সেটা জনসমক্ষে অথবা কোনও অনুষ্ঠানে বলতে হবে কেন? লিখে জানান না!

লেখকের মানসিক গঠন আর দর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মতো বিশুদ্ধ আনন্দ পাঠকের আর কিছুতেই নয়। আমরা জেনে গিয়েছি আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে কে পরকীয়া অথবা অবৈধ সামাজিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে কখনওই তাঁর গল্প-উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন না। মননে তিনি প্রচণ্ড আধুনিক হলেও সনাতন সামাজিক রীতির একান্ত সমর্থক। লেখক তাঁর রচিত কোনও একটি চরিত্রের জীবনচর্যায় অবশ্যই মিশিয়ে দেবেন নিজের জীবনদর্শন। আবার কোনও লেখক রীতিমতো পাঠকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ভালবাসেন। চরিত্রদের আচরণের মধ্যে দিয়ে তিনি যেন কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করবেন না। বুঝতেও দেন না কোন চরিত্রটি তাঁর প্রিয়। পাঠককে শুধু বিষয় নির্বাচনেই ঘোর লাগাবেন তাই নয়, চরিত্রসৃষ্টির অভিনবত্ব আর ঘটনা পরম্পরার মোচড়ে পাঠককে চরম মানসিক বিভ্রান্তিতে ফেলে দেওয়াও তাঁর কাছে প্রিয় খেলা।

সাহিত্যের সবচেয়ে বিশুদ্ধ দান হল চরিত্রনির্মাণ। সাহিত্যের কোন চরিত্রটা আপনার মতে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত? এরকম প্রশ্ন সাহিত্য আলোচনায় ওঠে। এবং এই প্রশ্নের উত্তর ঘিরেও জমে উঠতে পারে চমৎকার বিতর্ক। ঢোঁড়াই চরিত মানসের বোঝা বাঁওয়া, নাকি গণদেবতার দেবু পণ্ডিত। গোরা নাকি সন্দীপ? বিমলা নাকি সর্বজয়া? ধাত্রীদেবতার শিবনাথ নাকি শশী মাস্টার? এইসব তর্ক দিনের পর দিন চললেও মীমাংসার নয়। একটা কথা শোনা যায় চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করা গেলে সেই চরিত্রটি পাঠকের কাছের হয়ে ওঠে। আবার সাধারণত দেখা যায় সর্বগুণসম্পন্ন চরিত্রই বেশি জনপ্রিয়। প্রকৃত সাহিত্যমনস্কতা কিন্তু এই প্রবণতায় প্রকাশ পায় না। আর এই ধারাটিও রীতির প্রমাণ করে না। বরং পারিপার্শ্বিকে চোখে পড়েনি এরকম কিছু কিছু পরা বাস্তব চরিত্রই যেন পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। আর ওইসব চরিত্র নির্মাণের কারণে লেখকরা চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেন পাঠকের অন্তরে। তখন গৌণ হয়ে যায় লেখার উপজীব্য। যেমন বহেরু কিংবা নিতাই খ্যাপার চরিত্র। অথবা হারীত মণ্ডল। সেই যে বলেছিলাম পাঠকের সঙ্গে লেখকের লুকোচুরিও একটা আর্ট। আর এই ক্ষেত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কারিগর যে পাঠকের মননে ধরা দেওয়ার মতো সহজ সম্পর্কের অনেক দূরে থাকবেন তা বলাই বাহুল্য। সেই জন্যই তো তিনি বিশু, নন্দিনী আর রাজার চরিত্র সৃষ্টির পাশাপাশি অমিত রায়, নিখিলেশ, অভীককুমার, বিনোদিনী, এলা, অতীন, রতনের মতো ভিন্ন মানসিকতার কত মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমরা কখনওই থই পাইনি ওই লেখকের মনের বিস্তারের।

পাঠক-লেখক সম্পর্কের ব্যাথাতুর দিকটিরও উল্লেখ থাকা জরুরি। এই অনুভূতিকে বরং মান-অভিমান বললে অনেকটা স্পষ্ট হয়। বহু পরিশ্রম করে একটি সাহিত্য সৃষ্টির পর যখন কোনও লেখক বুঝতে পারেন বৃহত্তর পাঠক সমাজ সেটি গ্রহণ করেননি, তখন কেমন হয় তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া? গোটা পাঠকসমাজের প্রতিই কী তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন? আমরা জানি না। লেখকরা বলতে পারবেন। আবার প্রিয় লেখকের পরবর্তী বইটি সম্পর্কে দীর্ঘদিন প্রতীক্ষায় থাকা পাঠক যখন বইটি পড়া শুরু করার পরই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন তখন কিন্তু পাঠক স্রেফ বিরক্ত হন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কষ্ট পান। প্রিয় লেখকের নতুন লেখা ভালো না লাগা - এ যেন সেই পাঠকের নিজেরই ব্যর্থতা। আর এখানেই জয় বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রেমের।

একটা লাল শাড়ি... রুপোর ঝুমকো... আর কৃষ্ণচূড়া

শিঞ্জিনী চ্যাটার্জী,কলকাতা

কাঠ বাংলোয়ে, কাঠ হয়ে শীতে
জ্বলবে আগুন আর স্বপ্ন মিঠে
সাদা কালো চুলে আবছা কাঁচে
বাষ্প মেখে এক ফোঁটা জল পড়বে ধরা
পরবো সেদিন একটা লাল শাড়ি,
রুপোর ঝুমকো আর কৃষ্ণচূড়া

কুচকানো ঘাটের মুচকানো হাসি
ধামা চাপা দুখের ধুনো
আহ্লাদ না হয় আবদার
মুখ ফসকে ইস...স...স এটা কি ভাবে হোলো
একটা শালে ফোকলা গালে
ঘাটের মুখপোড়া
পরবো সেদিন একটা লাল শাড়ি
রুপোর ঝুমকো আর কৃষ্ণচূড়া ।

আকাশ ভরা হিমেল হাওয়া
বারণ হয়েছে চিনি খাওয়া
তোমাকে তোর ভেতর থেকে
অকারণে আরো চিনে যাওয়া
হাসি, ঠাট্টা, কান্না আর
না খাওয়ানো সব রান্না
চেনা স্বপ্নে অচেনা খুশি
শুধু খেয়ালী পোলাও গড়া
গড়ব না হয় শুধু একদিন
পরবো যেদিন তোর জন্য
একটা লাল শাড়ি
রুপোর ঝুমকো আর কৃষ্ণচূড়া ।

প্রেম

শিপ্রা সেন, কলকাতা

প্রেম একটি অতি ছোট কথা
তাকে নিয়ে দিনরাত কতই না মাথা ব্যথা।
প্রেম কি আকর্ষণ না অনুভূতি
বিবাহেই যার হয় শেষ পরিণতি।
কিন্তু যে প্রেম ব্যর্থ হয়
তা থেকে যায় সারা জীবন ।

না পাওয়া প্রেম থাকে মনের মণি কোঠায়
একান্তে সেখানে বিচরণ করা যায়
বলা যায় কত না বলা মনেরকথা
কখনো মনে জাগে আনন্দ
আবার কখনো পায় ব্যথা ।

পরিণতি পাওয়া প্রেম
হারিয়ে যায় সংসারের চাপে
কজন সেই প্রেমকে
হৃদয়ে ধরে রাখে
দায়বদ্ধতা পালনে
কেটে যায় বাকী জীবন
ব্যর্থ প্রেম মনে থাকে প্রতিক্ষণ
ভাবনায় জাগায় শিহরণ
বেঁচে থাকে মনের গভীরে
প্রেম জাগে চিরন্তন।

না থামা বৃষ্টি

সনৎ চক্রবর্তী

বৃষ্টি পড়ে গাছের পাতায়,
বৃষ্টি পড়ে ভুঁয়ে
বৃষ্টি পড়ে মাঠে মাঠে
ভেজে ছেলেবেলা।
বৃষ্টি পড়ে গ্রামে গ্রামে
ভাসে কলার ভেলা।
বৃষ্টি ভেজা জোয়ার জলে
ইলিশ মাছের ঢল।
পানসি নিয়ে ভেসে বেড়ায়
পরাণ মাঝির দল।।
বৃষ্টি আনে ভালবাসা
বৃষ্টি ভেজায় হিয়া
ভরা বাদল উড়ে যায়
মনের খবর নিয়া।
বৃষ্টি পড়ে মাথার উপর পুরোনো ছাঁদ চুঁয়ে।

আপনি কি জানেন?

১. "Trffic Signal"-এর প্রথম প্রচলন হয়েছিল আমেরিকাতে (১৮ই এপ্রিল ১৯৫৫ সাল) শুরুতে দুটি আলো ব্যবহৃত হত। সবুজ এবং লাল। সবুজ আলো বোঝাতো 'যাও' আর লাল আলো বোঝাতে 'থামো'।

২. পৃথিবীতে সবথেকে মূল্যবান 'Perfume' হল "Perfume Vi" - তৈরী করেছিলেন Arthur Bumham. ৪ ইঞ্চির শিশিকে হীরা দিয়ে মোড়ানো আছে - দাম ৭১৩৮০ আমেরিকান ডলার

৩. প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল ম্যাচ হয় ৰজ্মজ্ম সালে, উরুগুয়ুতে প্রথম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রথম বিশ্বকাপের প্রথম দুটি ম্যাচ একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্স বনাম মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্র বনাম বেলজিয়াম। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম গোল করেন ফ্রান্সের লুসিয়েন লরেন্ত। ফাইনালে উরুগুয়ে ৪-২ গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বকাপ বিজয়ী হয়।

৪. শোনা যায় ফুটবল খেলার শুরুতে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ শতকে গ্রীক ও রোম্যানদের মধ্যে এক ধরণের ফুটবল খেলা চালু ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে যে বল খেলা হত, তার নাম ছিল 'Calcio Storico' এটকেই মানা হয় আধুনিক ফুটবলের প্রাথমিক রূপ। এই খেলাতে সর্বাধিক চজ্জজন খেলোয়াড় থাকত। প্রত্যেক দলে বিভিন্ন সংখ্যার খেলোয়াড় থাকত, এবং গোলরক্ষক থাকত পাঁচজন, ১৮৭০ সালে আইন করে ঠিক করা হয় যে প্রতিদলে ১১ জন করে খেলোয়াড় থাকবে, তারমধ্যে একজন গোলরক্ষক, এই মালেই সম্ভবতঃ ছই মার্চ প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা হয় ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যান্ডের মধ্যে - ম্যাচটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছিল।

৫. স্বনামধন্য সমাজ সংস্কারক শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাংলা ভাষায় প্রথম 'বিরাম চিহ্ন'র প্রবর্তন করেন।

৬. বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবনিকাব্য শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে রচিত হয়।

৭. হিটলার এবং স্ট্যালিন দুজনেই প্রায় চারকোটি মানুষের হত্যার জন্য অপরাধী। কিন্তু দুজনেই একসময় 'নোবেল' শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন।

৮. আমেরিকার নেব্রাস্কা য় একটি গ্রাম আছে, যার অধিবাসী মাত্র একজন। সে নিজেই ওই গ্রামের মেয়র।

৯. 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট'-এর সৈন্যদের দাড়ি কামানো বাধ্যতামূলক ছিল, যাতে শত্রুপক্ষ দাড়ি পাকড়াও করে হারিয়ে দিতে না পারে।

১০. মধু হচ্ছে একমাত্র খাবার যা কখনও পচেনা বা নষ্ট হয় না।

অতৃপ্ত জীবন

বিপ্লব দাশগুপ্ত

বিষ্ণু সবে পঙ্গার ঘাট থেকেস্নান সেরে নিজের ডেরায় ফিরেছে। ঘটির জলটা দিয়ে পা ধুয়ে দাওয়া উঠেছে, ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ওর মেয়ে লালিমা, বলে ওঠে ! বাবা আজ স্বাধীনতা দিবস ?'

'কেন কি হল', বলে ওঠে বিষ্ণু

'আজ তো সকলের ছুটি... তোমার কি কোনো ছুটি নেই ?' জিজ্ঞাসা করে লালিমা ওর পুরাণে একটা লালরঙের নক্সাকরা শাড়ি, বয়স চোদ্দ-পনেরো হবে। শরীরে একটা বাঁধন আছে। হাসিমুখে আবদারের সুরে বলে, 'চল না আজ কোথাও ঘুরে আসি'।

বিষ্ণুর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে ও রিক্সা চালায়। গালভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কথাবার্তায় একটা রুক্ষতা জড়িয়ে আছে। মেয়ে লালিমার কথাটা শুনে হাল্কা স্বরে বলে ওঠে, 'আমাদের আবার ছুটি !' দুমুঠো ভাতের জোগাড় করতে করতে জীবনটা শুকিয়ে গেল... ছুটি নিয়ে ঘোরার সময় কোথায় ? বেজার মুখ করে বলে ওঠে, দে পান্তার হাঁড়িটা দে আর একটা পেঁয়াজ কেটে দে... দুগাল খেয়ে গাড়িটা নিয়ে বেরুই। কিছু টাকা কামাই হলেই ফিরে আসব ... সময় থাকলে আজ তোকেই সওয়ারী করব ওবেলা।" মনে মনে খুশী হয়ে লালিমা ভাতের হাঁড়িটা এগিয়ে দ্যায়, খাওয়া সেরে গায়ে ফতুয়াটা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে বিষ্ণু।

বাবুঘাটের পাশেই গঙ্গার পার ঘেঁষে ওদের বস্তী। অনেকদিন হল এখানে আছে মেয়েকে নিয়ে। বস্তিটার পাশ দিয়ে সার্কুলার রেলের লাইনটা চলে গেছে। কাজের দিনে এই ট্রেনটায় ভীড় হয়। এখানেই অনেক যাত্রী নেমে পায়ে হেঁটে বা রিক্সা নিয়ে ফেয়ারলি প্লেসের অফিস পাড়ায় যায়। সরকারি ভবন নিউ সেক্রেটারিয়েটে যাওয়ার যাত্রীও আছে অনেক, সকাল নটা থেকে এগারটা পর্যন্ত এই ট্রেনের যাত্রী নিয়ে যেতেই সময় চলে যায়। এগারটার পর ভীড় কিছু হাল্কা হয় কিন্তু তখন বড়বাজারে যাবার লোকও অনেক পাওয়া যায়। পাইকারী খুচরো ব্যবসায়ীর দল ট্রেন থেকে নেমে রিক্সা ধরে নেয়। দুপুর বেলায় মাল বইতে হয় বড়বাজারে... এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য। বিকেলে আবার অফিস পাড়া থেকে ফেরত যাত্রীদের নিয়ে আসে এই বাবুঘাটের রেলইয়ার্ডে। তখন হয়তো একটু সময় পেলে গঙ্গার ঘাটে এসে বসে। তারপর ঘাট থেকে কিছু সব্জী কিনে বাড়ি ফেরে। সারা দিনে মানুষ আর মুটে বয়ে হাত-পায়ের মাংসপেশীও ফুলে উঠেছে। মোটামুটি ভালই আয় হয় - দিনে সত্তর আশি টাকা। অর্দ্ধেকটা মালিককে দিয়ে দিতে হয়। কামাই-এর কিছুটা সরিয়ে রাখতে হয় গাড়ির মেরামতি কাজের জন্য, কারণ গাড়ি ঠিক রাখার দায়িত্বতারই। এমনকি সাইকেলের টায়ার-টিউব বদলাবার খরচও তাকে দিতে হবে। যাইহোক মোটামুটি দিন চলে যায়। ছুটির দিনগুলোতে একটু অসুবিধা হয় - কারণ কামাই একদম কমে যায়, কিন্তু মালিকদিন শেষে তার টাকা বুঝে নেয়, কারণ কামাই না হলেও দিনে কমপক্ষে কুড়িটা টাকা তাকে মনিবের হাতে তুলে দিতে হবে। এই টাকাটাই কামাই করতে বিষ্ণুকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। সাইকেল চালিয়ে চালিয়ে ওকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতে হয়। বড়বাজারের তুলোপট্টি - লোহাপট্টি কিরানাবাজার অবধিও চলে যেতে হয়, যদিকোন মাল বইবার সুযোগ আসে। শহরতলীর পাইকারী ব্যবসায়ীরা অনেক সময় কলকাতার হাট থেকে মাল কিনে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে করে নিয়ে যায়। এই মাল উঠাবার সময়ও প্রচুর ঝগড়া হয়। কারণ প্রতি বাজারের মোড়ে স্থানীয় রিক্সাচালক আছে। তাদের ন্যায্যপ্রাপ্য যদি বাইরের লোক নিয়ে যায়, তারা তো বাধা দেবেই। এমনকি কোনো কোনো সময়ে মাল উঠাবার অনুমতি দিলেও তাদের ডেরায় খাজনা দিতে হয় মোটা অঙ্কের। তারপর যদি কোনো রকমে পনেরো বিশ টাকা বাঁচে তো মনিবের টাকাটা হয়ে যায়। এই মনিবের টাকা জোগাড় করার জন্যেই বিষ্ণুকে ছুটির বারেও মুখ বেজার করে বেরোতে হয়।

সেদিনও বিষ্ণু গায়ে ফতুয়াটা চড়িয়ে বেড়িয়ে পড়ল। ছুটির দিন বলে সার্কুলার ট্রেনের ইয়ার্ডটাও ফাঁকা, রেল লাইন পার করে বিষ্ণু বড় রাস্তায় এসে পড়ল। আজ রাস্তাও একদম ফাঁকা । ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ট্যাক্সি নেই। দু একটা গাড়ি রাস্তা দিয়ে হুশহুশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু মিনিট রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিষ্ণু ভাবল কোন দিকে যাবে। তারপর রিক্সায় সীটে উঠে বসে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। ওর ভাগ্যটা বোধহয় ভাল ছিল, কিছুদূর এগুতেই দেখল কয়লাঘাট স্ট্রীটের মোড়ে কিছু মালপত্র নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন ?' লোকটি জবাব দিল যাব তো হাওড়া স্টেশন কিন্তু কোনো ট্যাক্সি বা বাস পাচ্ছি না।'

— 'আজ এখনপাওয়া মুশকিল আছে' বলে উঠল বিষ্ণু। লোকটি এদিক ওদিক তাকাল - এক মিনিট কি ভাবল - হাতঘড়িটা দেখল তারপর দরদস্তুর করে উঠে বসল। হাওড়া স্টেশন যাবে। তিরিশ টাকায় রফা হল। দূর আছে বেশ কিছুটা। কাঁধে ঝোলানো গামছায় মুখটা মুছে বিষ্ণু সওয়ারি নিয়ে এগিয়ে পড়ল।

সওয়ারিকে ছাড়তে ছাড়তে প্রায় পৌনে ঘন্টা লেগে গেল।

ছুটির পর বলে রাস্তাটা ফাঁকাই পেয়েছিল। প্রথম খেপেই তিরিশটা টাকা... টাকাটা হাতে নিয়ে একবার কপালে ছুঁয়ে কোমরে গুঁজে রাখল। পেয়ে গেল আর এক সওয়ারি - পোস্তা যাবে - তুলে নিল — আরও বিশটা টাকা। নিজের মনেই হেসে উঠল। বেলা গড়িয়ে গেল। আজ বাজার সব বন্ধ। রাস্তায় কোনো কোনো জায়গায় হকাররা দোকান সাজিয়ে বসেছে। টুকটাক অল্প দূরত্বের কিছু সওয়ারি পেল - বেশী পয়সার নয়, গরীব মানুষ 'না' করল না কিন্তু। ওর মণিবকে দেবার টাকা উঠে গ্যাছে । তাতেই ওর মন খুশ। দুপুর বেলা আনমনে রিক্সাটা নিয়ে আউট্রাম ঘাটে এসে থামল রাস্তায় লোক নেই। গাড়ি করে অনেকে এসেছে গঙ্গাস্নান করতে। বিষ্ণু রিক্সাটা এককোণে দাঁড় করিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে বসল।

একদিকে স্নানার্থীদের ভীড় - বিষ্ণু পাশ কাটিয়ে একটা উঁচু আদিকালের রাখা পাথরের উপরে বসল। গঙ্গায় ভাঁটা চলেছে। কিন্তু সুন্দর একটা ফুরফুরে হাওয়া বইছে - ঘর্মাক্ত শরীরে একটা সুন্দর প্রশান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দ্যায় । গঙ্গার এই পাশটা নির্জন, বিষ্ণু কোমরে গোঁজা টাকাগুলো গুনে ন্যায়, আশি টাকা কামাই হয়েছে। মনে পড়ে যায় মেয়ে লালিমার কথা । অনেক দিন বাইরে ঘুরতে যায়নি ... আজ বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হয়েছে ... বিষ্ণুও বলেছে পারলে ওর মেয়েকেই ও বিকেলের সওয়ারী করবে। কথাটা বলে বিষ্ণু নিজের মনে একবার দেখার চেষ্টা করেছিল মেয়ের মুখটাকে। একটা খুশির ঝলক ওর চোখের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

মা-মরা মেয়ে এই লালিমা। মেদিনীপুরের ইটামারা গ্রামে ওদের বাড়ি ছিল। বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ির দৌলতে বিঘে দুই চাষের জমি পেয়েছিল বিষ্ণু। তাতেই জোত লাগাত। বিষ্ণু আর তার বউ দুজনের বেশ আনন্দে দিন চলে যেত। বছরে তিনবার ফসল হত, তার মধ্যে একবার হত আমন চাষ। কিন্তু দুবারেই যা ফসল উঠত নিজেদের জন্য রেখে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকত। সেই ধান বেচে দিত ধানের গোলায় । একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে ওদের সংসার বানিয়েছিল। তারই পাশে খোলা জায়গায় কিছুটা ঘিরে সব্জি ক্ষেত বানিয়েছিল, কিছু হাঁস মুরগীও রেখেছিল। এই সমস্তই দেখাশুনা করত ওর বউ, আর বিষ্ণু যেত ক্ষেতে লাঙল দিতে। ওর বউ ভাল মাছ কাটতে পারত এই জন্য আড়তদারের বাড়ি থেকে প্রায়ই ডাক আসত মাছ কেটে দেবার । আড়তদারের বড় পুকুর থেকে বড় বড় মাছ আসত। সেই মাছ কেটে পারিশ্রমিকবাবদ ওর ভাগ্যে জুটত দু-একটা ছোট মাছ অথবা বড় মাছেরই দু-চার পীস। তাতে সন্তুষ্ট থাকত ওরা। আড়তদারের গোলাতে ধান মাড়াইয়ের কাজও করত ওর বউ। আড়তদারের বউ খুব ভাল ছিল। ওর বউকে ভোলমন্দ খেতে দিত — কখনও চিড়ে মুড়ি ঘরের জন্য দিত। পূজা-পার্বণে নতুন শাড়ি বিষ্ণুর জন্য আট হাতি ধুতি গামছা আলতা-সিঁদুর দিত। বেশ ভালই দিন কাটত ওদের। এরপর একদিন ওর বউ-এর পেটে লালিমা এল। লালিমার জন্ম হলে ওই আড়তদারের বউ গ্রামের অনেক মজুরকে খাইয়েছিল। লালিমাকে অনেক কিছু দিয়েছিল।

কিন্তু তখনই যেন বিপদের মেঘ নেমে এসেছিল বিষ্ণুর পরিবারে। লালিমার জন্মের পরই ওর বউ সুতিকা রোগে আক্রান্ত হয়। ওর বউ-এর শরীরটা দিন দিনই শুকিয়ে যেতে থাকে। কাজে মন দিতে পারে না, আড়তদারের বউ অনেক সাহায্য করেছিল। লালিমাতো ওদেরই অঙ্গনে খেলে বড় হতে লাগল। ওর খাওয়া-জামা কাপড় সবই ওরা দিত। ওর বউ সারাদিন ওই কুঁড়েতে শুয়ে বসে থাকত । গায়র শক্তি কমে যেতে লাগল। খাটুনি বেড়ে গেল বিষ্ণুর। সারাদিন ক্ষেতের কাজ করে এসে বউ-এর সেবায় লেগে থাকত। এক বছর ধরে গ্রামের বিভিন্ন ডাক্তার কবিরাজকে দেখালো কিন্তু ওর বউয়ের শারীরিক উন্নতি হল না। আড়তদারের বউ-এর দৌলতে কাঁথি শহরে বড় ডাক্তারের কাছে ওর বউকে দেখাতে শুরু করল বিষ্ণু। চাষের ক্ষেতে ঠিকমত সময় না দিতে পারায় ফসলের আয়ও কমে গেল। পুরো আমন চাষটাই নষ্ট হয়ে গেল। জোতদারের কাছে দেনা হতে শুরু করল। ওর বউ-এর জন্য ডাক্তারি পথ্য ইত্যাদির আয়োজন করতেও অনেক অর্থের প্রয়োজন - দেনা হল আড়তদারের কাছেও। লোকটি ভাল ছিল বলে বিষ্ণুকে কখনও টাকা ফেরত দেবার তাগাদা করে নি। বরং বিষ্ণুকে আরও টাকার জোগাড় দিত। বলত, 'তুই ভাবিস না... তোর বউ সেরে উঠলে আমার ধান মাড়াই করেই সব টাকা শুধে দিবে।'

কিন্তু সেটাও হল না। দুই বছরের মাথায় দীর্ঘ রোগভোগের পর ওর বউ সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। নিঃস্ব হয়ে গেল বিষ্ণু। কি করবে কিছুই ভেবে পায় না মেয়ে লালিমাও বড় হচ্ছে। ক্ষেতের কাজে মন লাগে না। জোতদারও টাকা আদায়ের তাগাদা করে। সেই একদিন আড়তদারের সাথে আলোচনা করে ঠিক করল যে বিষ্ণু ওর জমিটা বেচে দেবে আড়তদারের কাছে, আড়তদারই ওর সব দেনার ঠেকা নেবে বিষ্ণু চলে যাবে শহরে — ওর মেয়েকে নিয়ে। ও শুনেছিল শহরে অনেক কাজ পাওয়া যায়। ঠিকা মজুরের কাজ করলেও বিষ্ণু পেটের ভাত জোগাড় করতে পারবে। কিন্তু গ্রামে তার মন টিকছে না। সব সময় ওর বউ-এর কথা মনে পড়ে। তখন আর কোনো কাজে মন লাগে না। এ রকম ভাবে তো বেশিদিন চলতে পারে না — ও নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়বে - ওদিকে মেয়ে

লালিমাকেও বড় করতে হবে।

আড়তদারের বউ খুব ভাল ছিল। আর তাছাড়া ওনার কোনো সন্তান ছিল না। বয়সের সাথে সাথে সন্তান সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। লালিমা জন্মের পর থেকে ওরই কাছে বড় হচ্ছিল। তাই লালিমার উপরও ওনার মায়া পড়ে গিয়েছিল। বিষ্ণুর সাথে তো লালিমাও চলে যাবে। তাহলে ওনার ঘরটাও তো খালি হয়ে যাবে। ওনার দিন কি করে কাটবে? অনেক চিন্তা ভাবনা করে তিনি তাঁর মনের বাসনা তাঁর স্বামীকে বলে বোঝালেন। সেইমত একদিন আড়তাদর বিষ্ণুকে ডেকে বোঝাল, 'দ্যাখ বিষ্ণু তোমার থাকা খাওয়ার কিছু ঠিক থাকবে না শহরে গেলে। আর এখানে থাকলেও তুমি কোন কাজে মন দিতে পারছ না। সুতরাং তোমার শহরে যাওয়াই ভালো । কলকাতা শহর এখান থেকে অনেক দূর... ট্রেনে করে যেতে হয়। ওখানে কাজ আছে, কিন্তু খুঁজে নিতে হবে, তাই বলছিলাম কি... লালিমা আমাদের বাড়িতে যেমন বড় হচ্ছে হতে থাকুক। তোমার গিন্নীমাও খুশি আর লালিমাও খুশি। কেন তাকে কষ্ট করে তোমার সাথে নিয়ে যাবে। তার থেকে বরং তুমি ওকে তোমার গিন্নীমার কাছে রেখে, ঝাড়া হাত পায়ে শহরে যাও। নিজেএকটু সুস্থ হয়ে বসে, একটা ঠিকানা জোগাড় করে খবর দিও। লালিমাকে তখন নিয়ে যেও।

আড়তদারের এই যুক্তিটা বিষ্ণুর খুব মনে ধরেছিল। যদিও মেয়েকে ছেড়ে যেতে মনটা চাইছিল না। কিন্তু বিদেশে অনিশ্চিতের মধ্যে ওকে নিয়ে গিয়ে কোথায় থাকবে? একটা অজানা আশঙ্কায় মনটা শিউরে উঠেছিল। তাই একদিন সরাসরি মেয়ে লালিমাকে কোলে টেনে নিয়ে সব কথা বলল। লালিমাতো তখনও শিশু এসব বুঝবে কেমন করে। গিন্নীমার কাছে থাকবে শুনে ওর মনটা খুশিতেই ভরে উঠেছিল। তাই মাথা ঝাঁকিয়ে বিষ্ণুকে গালে আদর করে ওকে ছেড়ে যাবার অনুমতি দিয়েছিল। এই ভাবে একদিন বিষ্ণু সব ছেড়ে, আড়তদারের দেওয়া অল্প কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছিল কলকাতা শহরের দিকে।

হঠাৎ একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে গেল বিষ্ণুর শরীরে ভিতর থেকে। গঙ্গার পারে ও একাই বসেছিল। হাওয়ায় জলে ছোট ছোট ঢেউ খেলছে।.. তারপর থেকে কত বছর হয়ে গেল - বিষ্ণু মুটে মজুরের কাজে সময় কাটাল। বড়বাজারের অলি গলি ওর মুখস্থ হয়ে গেল। সারাদিন খাটুনির পর এই গঙ্গার পাড়ে সিমেন্টের বাঁধানো ঘাটে এসে শুয়ে পড়ত। রাত গড়িয়ে যেত পরদিন সকালে গঙ্গায় স্নান করে বেরিয়ে পড়ত কাজে। অর্থের অভাবে গ্রামেও যাওয়া হয়নি। বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছিল। গঙ্গার পাড়ে এই বস্তীতেই একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছিল। ঘাটের প্রহরীরাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এরপর একদিন এক মণিব জোগাড় হয়ে গেল। তার রিক্সা চালাবার লোকের দরকার ছিল। বেশ কিছু রিক্সা ছিল তার। বিষ্ণু গ্রামে থাকতে সাইকেল চালাতে জানতো। এই কাজটা ওর ভাল লাগল - একটা স্বাধীন কাজ - নিজের ইচ্ছেমত কাজ করতে পারবে। সেই মণিবের সাথে যোগাযোগ করে রিক্সা চালকের কাজ শুরু করল। কিছু পয়সা জমাতে পারল। বস্তীতে নিজের ঝুপড়িটা একটু বড় করে নিল - এবার ইচ্ছে হল মেয়ে লালিমাকে নিয়ে আসার। লালিমা তখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। প্রায় তিন-চার বছর কেটে গ্যাছে — এখন কি বিষ্ণুকে চিনতে পারবে? আর পারলেই বা ওর গিন্নীমা কি লালিমাকে ছেড়ে দেবে? নানান চিন্তায় বিষ্ণুর মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল। একদিন ঠিক করল পুরোনো ভিটেতে ফিরে যেতেই হবে। মেয়ে লালিমাকে একবার দেখা দিতেই হবে। লালিমা ওর বউ-এর রেখে যাওয়া একমাত্র মূলধন।

বিষ্ণু যেদিন এসে দাঁড়াল ওর পুরোনো ভিটে ইটেমারাতে। তখন অনেক পাল্টে গেছিল ওর গ্রামের পরিবেশ। অনেক বছর কেটে গেছে - লালিমাকে অনেক ছোট রেখে গেছিল। কিন্তু আজ লালিমাকে দেখে বিষ্ণু চমকে উঠল। অনেক বড় হয়ে গিয়েছে একটা ফ্রক পরে ওর সামনে দাঁড়িয়ে। সে ওর বাবাকে চিনতে পেরেছে। দালানে বাবাকে দেখে দৌড়ে এসে বিষ্ণুর হাত ধরে বলে উঠেছে আমাকে মনে আছে বাবা?' তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? কেন আসনি আমার কাছে...। অনেক প্রশ্ন লালিমার। বিষ্ণুর কোনো জবাব নেই। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলে 'এই তো এসে গেছি। বিষ্ণুর দুচোখ বেয়ে তখন জল নেমে এসেছে। দালানেই বসেছিল আড়তদার। বিষ্ণুকে দেখে শুধু বললেন 'তুমি এসেছ বিষ্ণু... ভালই হয়েছে... তুমি কি কিছু ঠেক বানিয়েছ?' বিষ্ণু শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। আড়তদারই বলে উঠল, 'তোমার গিন্নীমা সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে। আমাকে আর কোনো দায়িত্ব বন্ধনে বেঁধে রেখো না বিষ্ণু। এবার অব্যাহতি দাও।' বিষ্ণু বুঝতে পেরেছিল আড়তদারের মনের কথা। মুখে কিছু বলতে পারেনি। পরের দিন গুছিয়ে মেয়েকে নিয়ে চলে এল কলকাতায়। এই বস্তির ঘরে। সেই থেকে লালিমা আছে এখানে। কত বছর কেটে গেল তারপরে। লালিমা এই বস্তিতে সকলের প্রিয়। শাড়িতে লালিমাকে অনেক সুন্দর দেখায়। বিষ্ণু যখনই ওকে বলেছে, 'এবার একটা ভাল ছেলে পছন্দ করে বিয়ে কর।' লালিমা হেসে উত্তর দিয়েছে, 'তোমাকে একলা ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।' বিষ্ণু তাচ্ছিলের স্বরে বলেছে, 'ধ্যুৎ তাই কি কখনও হয়?'

গঙ্গার পাড়ে বসে আছে। অনেকটা সময় হয়ে গেল। আজ আর সাইকেল নিয়ে বেরোতে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া আজ ছুটির দিনে সওয়ারি কোথায় পাবে? লালিমার ইচ্ছে হয়েছে একটু বেড়াতে যাবে... বিষ্ণুও বলেছে ওবেলা ওকেই সওয়ারি করবে... ছুটির দিনে কামাইও খারাপ হয়নি। হাতপা ঝেড়ে ওঠে পড়ল বিষ্ণু। মণিবের কাছে গিয়ে ওঁর পয়সা মিটিয়ে বাড়িতে হাজির হল।

তখন বিকেল গড়িয়েছে। বিষ্ণুকে দেখে ওর মেয়ে লালিমা খুব খুশি। মোটামুটি নিজেকে সাজিয়েই বসেছিল। কলাই-এর থালায় চারটে রুটি আর তরকারী নিয়ে এল। বিষ্ণু বাড়ি ফিরলেই হাতমুখ ধুয়ে কিছু খায়। লালিমার নজর সব দিকেই আছে। খাবার খেয়ে মেয়েকে নিয়ে বেরোল বিষ্ণু। ওর মনটাতেও আজ ভীষণ আনন্দ। রিক্সাটা ঠেলে রাস্তায় নামিয়ে বলল 'বোস... আজ তুই আমার সন্ধ্যার সওয়ারি। যেখানে যাবি, সেখানেই নিয়ে যাব। লালিমা উঠে বসল রিক্সায়। বিষ্ণু চালক... এগিয়ে চলল... গঙ্গার পাড় ধরে। চলতে চলতে বিষ্ণু মেয়েকে কলকাতার বিভিন্ন রাস্তা - বড় বড় বাড়ি চেনাচ্ছে। দুজনে মিলে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে গেল রানি রাসমণি ঘাটে। অনেকক্ষণ গঙ্গার ঘাটে বসল। লালিমারও খুব আনন্দ, রাস্তার পারে গরম গরম পাকোড়া... ফুচকা মনের ইচ্ছামত খেল। বিষ্ণু আজ মেয়েকে বাধা দেবে না। সেই কতদিন আগে এইভাবে গ্রামের মেলায় বউকে নিয়ে বেরিয়েছিল। ওখান থেকে ওর বউ বরফের কুলপি কিনে খেয়েছিল। তারপর খুব ঝাল মশলা দেওয়া ছোলা খেতে খেতে উঃ উঃ ডাক দিয়ে উঠছিল। বেশ মজা লেগেছিল বিষ্ণুর।.. আজ ওর মেয়ে লালিমাকে দেখেও সেইরকম মজা পাচ্ছিল। ওখান থেকে বেরিয়ে ওরা পৌঁছে গেল হাওড়া ব্রীজের নীচে। এখান থেকে মানুষ স্টীমারে করে গঙ্গা পারাপার করে। জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে স্টীমার। আজ ছুটি বলে বেশি ভীড় নেই। তবুও হাওড়া স্টেশন থেকে আসা যাত্রীর দল এগিয়ে চলেছে জেটির দিকে। ওপাড়ে ফেয়ারলি প্লেস, সেখানে নেমে চলে যাবে যে যার গন্তব্যস্থলে। স্টীমার একটা সবে এসেছে। ওপাড়ের লোক নেমে আসছে ট্রেন ধরতে।

বিষ্ণু তার মেয়ে লালিমাকে সব দেখাচ্ছিল। পথের ধারে ছোট ছোট হকাররা বসেছে। লালিমার একটা লাল চুন্নী খুব পছন্দ হল। বিষ্ণু ওর মনের কথা বুঝতে পেরে কিনে দিল। চুন্নীটা পেয়ে লালিমা খুব খুশি গলায় জড়িয়ে রাখল। পাশে ঝালমুড়িওয়ালার কাছ থেকে এক ঠোঙা মুড়ি কিনে খেতে খেতে আরও এগিয়ে গেল। বিষ্ণুও এক খিলি পান কিনে মুখে দিল। অনেকদিন সে পান খায় নি। সূর্য্য তখন অস্তাচলে, সারা আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে লাল রঙের মাধুরী। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এল। অনকক্ষণ বসেছিল ওরা ওই গঙ্গার পাড়ে। একটা লোক বাঁদর খেলা দেখাচ্ছিল। লালিমার দেখতে বেশ ভাল লাগছিল। এমনি করেই সুন্দর কিছু সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল ওরা বুঝতে পারল না। রাত হয়েছে। বাড়ি ফেরার আগে কিছু খেতে হবে। বিষ্ণু মেয়েকে নিয়ে একাট ছোট হোটেলে ঢুকল। ওখানে মাংস-ভাত পাওয়া যায়। হোটেলটায় একাট টিভিও রাখা আছে। ওখানে বেশ সুন্দর একটা ছবি দেখানো হচ্ছে। লালিমা বসে বসে ছবিটা দেখছে ওর খুব ভাল লেগেছে। হোটেলের মালিকেরও কোনো তাড়া নেই। বিষ্ণু চা-নোনতা বিস্কুটও নিল যাতে কেউ কিছু বলতে না পারে।

রাত গড়িয়ে গেল। ওরা যখন খাওয়া সেরে হোটেল থেকে বেরোল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। আজ খুব ভাল লেগেছে লালিমার। আনন্দের আতিশয্যে বাবাকে জড়িয়ে ধরে আদরও করেছে। লালিমা এসে রিক্সায় বসল। এবার ঘরে ফেরার পালা। বিষ্ণুও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সাইকেল চালিয়ে চালিয়ে বিষ্ণুও মনে হয় হাঁফিয়ে উঠেছে। পা যেন আর টানতে চাইছে না। কিন্তু অনেকদূর ওরা এসে গেছে। ফিরে তো যেতে হবেই। বাড়ি ফিরে না হয় মেয়েকে বলবে পাটা মালিশ করে দিতে। ধীরে ধীরে ওরা স্ট্র্যান্ডরোডের রাস্তায় এসে পড়ল। রাস্তাটা আজ অন্ধকার লাগছে। বড় বড় অফিসবাড়িতে কোনো আলো জ্বলছে না। ভূতের বাড়ির মত দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার বাতিগুলোও যেন টিম টিম করে জ্বলছে। মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ি হুস হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে। দূর পাল্লার বাসগুলো বাবুঘাট থেকে ছেড়ে দিয়েছে। সেগুলো খুব জোরে জোরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওদের হেডলাইটগুলো যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বিষ্ণু কোনরকমে পাশ কাটিয়ে রাস্তার এক ধার দিয়ে চলেছে। ক্লান্ত দেহটাকে টেনে পায়ে জোর লাগিয়ে সাইকেল প্যাডল করছে।

হঠাৎ অঘটনটা ঘটে গেল। কয়লাঘাট স্ট্রীটের মোড়টা ওরা পেরোচ্ছিল। আচমকা একটা ম্যাটাডোর কয়লাঘাট স্ট্রীটের গলি থেকে স্ট্যান্ড রোডে ঢুকে পড়তে যাবে, কি হল বুঝতে পারল না বিষ্ণু, গাড়িটা সোজা এসে ধাক্কা মারল ওর রিক্সাতে - ছিটকে গেল ওরা দুজনে। রিক্সাটা খেলনার মত শূন্যে উঠে রাস্তার ওপাশে গিয়ে পড়ল। ছিটকে পড়ল বিষ্ণুর দেহটা - উল্টোদিকের কোণায় ফুটপাতে ধাক্কা খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। লালিমার রক্তাক্ত দেহটা ছিটকে পড় ল রাস্তার মাঝখানে। কোনো জ্ঞান নেই লালিমার শরীরে। উল্টোদিক থেকে বেগে আসা বাসটা বুঝতে পারল না কি ঘটে গেল সামনে। মুহূর্তের মধ্যে বাসটা লালিমার নিথর দেহটা চাকায় পিষে সামনে বেরিয়ে গেল। হারিয়ে গেল দুটো অতৃপ্ত জীবন।

দাঁড়াও পথিকবর

নীলাদ্রি দুয়ারী

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
যশোরে সাগর দাঁড়ি কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজ নারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী"

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিস্থলে তাঁরই লেখা এই কবিতাটি লেখা রয়েছে।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি বাংলার যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাজনারায়ণ দত্ত ও তাঁর প্রথমা স্ত্রী জাহ্নবীর একমাত্র সন্তান। রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কোলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের এক খ্যাতনামা উকিল।

মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা তার মার কাছে। জাহ্নবী দেবীই তাঁকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত করে ছিলেন। সাগরদাড়ির পাশের গ্রাম শেখপুরা মসজিদের ইমাম মুফতি লুৎফুল হকের কাছে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। ইমামের কাছে তিনি বাংলা, ফরাসী ও আরবি পড়েছেন। সাগরদাঁড়িতেই মধুসূদনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়।

১৮৩৪ সালে মধুসূদন কোলকাতায় আসেন। স্থানীয় একটি স্কুলে কিছুদিন পড়ার পর তিনি হিন্দু কলেজে ভরতি হন। মধুসূদন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাই কিছুদিনের মধ্যে তিনি কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি.এল. রিচার্ডমনের প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন। রিচার্ডসন মধুসূদনের মধ্যে কাব্যপ্রীতি সঞ্চারিত করেছিলেন। ১৮৪২ সাল থেকেই মধুসূদন বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখার ছদ্মনাম ছিলো টিমোথি পেনপোয়েম। পাশ্চাত্য সাহিত্যের দুর্নিবার আকর্ষণ বশত ইংরেজি ভাষায় রচনার প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। কম বয়সেই তাঁর মহাকবি হওয়ার ও বিলাতে যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

১৮৪৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে মিশনরোতে অবস্থিত ওল্ড মিশন চার্চে গিয়ে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁকে দীক্ষিত করে ছিলেন পাদ্রী ডিলট্রি। তিনিই তাঁর 'মাইকেল' নামকরণ করেন। মধুসূদন পরিচিত হন 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' নামে।

রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর বিধর্মী পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর তাঁর আর হিন্দু কলেজে পড়াশুনা হয় না। তিনি শিবপুরের বিশপস কলেজে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যান। এখানে তিনি গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। বাবা তাঁকে পরিত্যাগ করলেও, কলেজে পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করে ছিলেন। ১৮৪৭ সালে চার বছর পর পড়াশুনা শেষ হলে তিনি টাকা পাঠানো বন্ধ করেন।

কোলকাতায় চাকরীর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন মধুসূদন। ১৮৪৭ সালে তিনি রওনা হন মাদ্রাজে। স্থানীয় খ্রীষ্টান ও ইংরেজদের সহায়তায় তিনি 'মাদ্রাজ অরফান এসাইলাম' স্কুলে শিক্ষকের চাকরি পান। তবে বেতন যা পেতেন, তাতে তার ব্যায় সংকুলান হতো না। এইখানে তিনি ৩১শে জুলাই ১৮৪৮ সালে রেবেকা ম্যাকটিডিসা নামে এক ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। এই সময় মধুসূদন ইংরেজি পত্রপত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। মাদ্রাজ ক্রনিকল পত্রিকায় ছদ্মনামে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। হিন্দু ক্রনিকল নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন মধুসূদন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অর্থাভাবে পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে হয়। পঁচিশ বছর বয়সে নিদারুন দারিদ্র্যের মধ্যেই তিনি 'দ্যা ক্যাপটিভ লেডী' ও 'ভিশান ওফ দি পাস্ট' কাব্য রচনা করেন। কবি ও দক্ষ ইংরেজি লেখক হিসেবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে রেবেকার দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। সাত বছর পরে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। রেবেকার গর্ভে মধুসূদনের দুই পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। ছাড়াছাড়ির পর রেবেকা পুত্র ও কন্যাদের নিয়ে বিলেত চলে যান।

মাদ্রাজ জীবনের শেষ পর্বে রেবেকার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার অল্পকাল পরে মধুসূদন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের কোনো এক শিক্ষকের কন্যা সোফিয়া হেনিরিয়েটাকে বিবাহ করেন। হেনিরিয়েটা সর্বগুণ সম্পন্ন রুচিমার্জিত মেয়ে ছিলেন। হেনিরিয়েটা মাইকেল মধুসূদনের সারজীবনের সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁদের নেপোলিয়ান নামে এক ছেলে এবং শর্মিষ্ঠা নামে এক মেয়ে হয়। তাঁর বংশধরদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ।

এদিকে মাইকেল 'দ্যা কাপটিভ লেডী'র এক কপি বন্ধু

গৌরদাস বসাককে উপহার পাঠালে, গৌর দাস সেটিকে জে.ই.ডি. বেথুন কে পাঠান। ওই বই পড়ে অভিভূত বেথুন মাইকেলকে চিঠি লিখে মাদ্রাজ থেকে কোলকাতায় ফিরে আসতে এবং বাংলা ভাষায় কাব্যরচনা করতে পরামর্শ দেন। বাবা মারা যাওয়ায় ১৮৫৬ সালে মধুসূদন কোলকাতায় ফিরে আসেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাট্যকার হিসেবেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গঁনে পদার্পণ করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব বোধ করেন। এই অভাব পুরণের লক্ষ্য নিয়েই তিনি নাটক লেখায় আগ্রহী হয়েছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রচনা করেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। 'শর্মিষ্ঠা' একটি পৌরাণিক নাটক। এটিই আধুনিক পাশ্চাত্য শৈলীতে রচিত প্রথম বাংলা নাটক। নাটকের আখ্যানবস্তু মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রাজা যযাতি, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী থেকে গৃহীত। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি অভিনীতও হয়।

'শর্মিষ্ঠা'র পরে ১৮৬০ সালে মাইকেল রচনা করেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে দুটি প্রহসন। প্রথম নাটকটির বিষয় ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাবু সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল সমাতন পন্থী সমাজপতিদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন। এই নাটকে মাইকেলের পর্যবেক্ষণ শক্তি, সমাজ বাস্তবতাবোধ ও কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপ রচনায় কুশলতার বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। ১৮৬০ সালেই মাইকেল রচনা করেন 'পদ্মাবতী' নাটক। এটি পৌরাণিক নাটক। তবে এই নাটকের ভিত্তি পুরোপুরি ভারতীয় পুরাণ নয়। গ্রীক পুরাণের 'অ্যাপেল অফ ডিসকার্ড' গল্পটি ভারতীয় পুরাণের মোড়কে পরিবেশন করেন মধুসূদন।

১৮৬১ সালে মাইকেল লেখেন নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডি নাটক। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হলো, কৃষ্ণকুমারী, মদনিকা, ভীম সিংহ, জগৎ সিংহ, ধনদাস প্রমুখ।

কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার পর মাইকেল কাব্যরচনায় পুরোদমে মনোনিবেশ করেন, শেষ জীবনে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ণধার শরচ্চন্দ্র ঘোষের অনুরোধে তিনি 'মায়াকানন' নাটকটির রচনায় হাত দেন। নাটকটি তিনি শেষ করতে পারেননি। করেছিলেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ সালে। ১৮৬০ সালে মধুসূদন রচনা করেন 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য। বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। 'পদ্মাবতী' নাটক লিখবার সময় মধুসূদন প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন। পরে ছন্দে পুরোপুরি কাব্যগ্রন্থ রচনার ফসল হলো 'তিলোত্তমা সম্ভব।'

১৮৬০ সালেই মধুসূদন রচনা করেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে - অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামক মহাকাব্যটি। চরিত্র চিত্র হিসেবে রয়েছেন রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, সীতা, সরমা, প্রমীলা প্রমুখ। তিনি তাঁর কাব্যকে অষ্টাধিক সর্গে বিভক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন

'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' তবুও কাব্যে করুন রসের অবতারণা হয়েছে প্রথম সর্গে

'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবী অমৃতভাষিনি
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে, পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাখবারি ?'

'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যটি প্রকাশ পায় ১৮৬১ সালে। এটি কৃষ্ণবিরহী রাধিকার বিলাপস্বরূপ কয়েকটি কবিতা।

'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন ১৮৬২ সালে। এটিও অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। শকুন্তলা, তারা, রুক্মিনী, কৈকেয়ী প্রভৃতি ১১ জন মহিলার দুষ্মন্ত, সোম, দ্বারকানাথ, দশরথ প্রভৃতি নিজ নিজ প্রিয়জনের নিকট লেখা কবিতায় নিজেদের মনের ভাষা ব্যক্ত করেছিলেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দেই ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য চলে গেলেন ইংল্যান্ড। কিন্তু সেখানের বর্ণবাদিতার ও আবহাওয়ার জন্য বেশি দিন ইংল্যান্ডে থাকেননি। তারপর তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে চলে যান। কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। একমাত্র ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্য তিনি তাঁর আইন বিষয়ে পড়া শেষ করে ভারতে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মধুসূদন দেশে ফিরে এলেন ১৮৬৭ সালে। ইউরোপে থাকাকালীন ১৮৬৬ সালে মধুসূদন সনেটের অনুসরণে বেশ কিছু চতুর্দশপদী কবিতা লেখেন। দেশে এসে তিনি কোলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেন। কিন্তু তিনি তাঁর আইন শিক্ষাকে বিশেষ কাজে লাগাতে পারেননি।

১৮৭১ সালে 'হেক্টর বধ' গদ্যকাব্য রচনা করেন। কিন্তু মধুসূদন এটিকে সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

মধুসূদনের শেষ জীবন চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। বলাবাহুল্য আর্থিক উপার্জনে তিনি তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তাছাড়া অমিতব্যয়ী স্বভাবের জন্য তিনি ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়েন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে কপর্দকহীন (অর্থাভাবে) অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কবি পত্নী সোফিয়া হেনিরীয়েটা তাঁর তিন দিন পূর্বে গত হন। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মহাকবি জন্মভূমির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ব্যক্ত করে লিখেছেন।

'রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ।
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
.....
জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা ডরি শমনে,'
....

কত রূপ দেখি তোমারে ?

বিয়ের পর বউয়েরা কেমন বদলে যায়, একবার দেখা যাক

প্রথম বছর ঃ আমি বলছিলাম খাবার খেয়ে নাও ! তুমি সকাল থেকে কিছু খাওনি।

দ্বিতীয় বছর ঃ শুনছো, খাবার তৈরি হয়ে গেছে, দেব কী ?

তৃতীয় বছর ঃ খাবার তৈরি আছে। কখন খাবে বলবে।

চতুর্থ বছর ঃ খাবার বানিয়ে রেখেছি। আমি একটু বাজার যাচ্ছি, খিদে পেলে বেড়ে খেয়ে নিও...

পঞ্চম বছর ঃ শোনো, আজ আর খাবার বানাতে পারব না, হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে নাও...

ষষ্ঠ বছর ঃ যখনই দেখো শুধু খাই খাই, এই তো সকালেই তো খেলে...

সপ্তম বছর ঃ বিয়ের পর থেকে খাবার বানাতে বানাতেই আমার জীবন কেটে গেল। এইজন্যই কি বিয়ে করেছিলে....

অষ্টম বছর ঃ এবার একটু রান্নাঘরেও হাত বাটাও। কাজের নাম করে সারাদিন শুধু বাইরে স্ফূর্তি করলে চলবে ?

বিয়ের পর স্বামী কেমন বদলে যায়, একবার দেখা যাক

প্রথম বছর ঃ ওগো, সাবধানে চলো, দেখো গর্ত আছে।

দ্বিতীয় বছর ঃ আরে বাবা দেখবে তো ? সামনে গর্ত আছে।

তৃতীয় বছর ঃ দেখতে পাচ্ছ না, সামনে গর্ত।

চতুর্থ বছর ঃ অন্ধ নাকি ? সামনে গর্ত দেখতে পাচ্ছ না ?

পঞ্চম বছর ঃ আরে ওদিকে কোথায় মরতে যাচ্ছ, সামনের গর্ত দেখতে পাচ্ছ না।

ষষ্ঠ বছর ঃ তুমি কার দিকে তাকিয়ে চলথ বলতো ? গর্ত দেখতে পাচ্ছ না...

সপ্তম বছর ঃ অত দুলকি চালে রাস্তায় চললে হবে ? এরপর গর্তে পড়ে বা খোঁড়াবে...

অষ্টম বছর ঃ অন্ধের মত গর্তে পড়, এরপরই ডাক্তার ওষুধের খরচা বাড়াবে...।

পাত্র চাই

পাত্রী ঃ ময়ূরী গুহ, ২৬ বছর ৫ ফুট, ওজন ঃ ৫৫ কেজি

শিক্ষা ঃ Persuing B.A. (Corrospondance) from D.U.
Completed N.T.T. Nursery Teachers Training from Nida and also done Industrial Accounting course and Diploma in Comupter Application.

যোগাযোগঃ G-237A, Sector-22, Noida
Mob. : 0999983153

পাত্র চাই

পাত্রী ঃ জুহী রায় ; ২৬ বছর ; ৫ ফুট ১ ইঞ্চি

ওজন ঃ ৪৯ কেজি

কর্মস্থান ঃ প্রাইভেট কোম্পানীর গ্রাফিক ডিজাইনার

শিক্ষা ঃ B.Com + Animation 3D

পিতা ঃ তপন কুমার রায়
A1/112, Sector-6, Rohini,
Delhi-110085
Mob. : 9310798340, 7010979794

স্বাধীনতা দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন সায়ন্তনী নৃত্য শিক্ষায়তনের শিল্পীরা

সঙ্ঘবার্তা

গত পনেরই আগস্ট আমাদের মন্দির প্রাঙ্গণে খুবই সমারোহে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অনেক স্থানীয় দর্শক এবং সদস্যদের উপস্থিতিতে এই পতাকা উত্তোলন সমারোহ পালিত হয়। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের উপর আমাদের প্রপীণ সদস্য শ্রী বিপ্লব দাশগুপ্ত লিখিত একটি তথ্যবহুল রচনা পাঠ করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

শারদীয়া দুর্গাপূজা সমাগত। প্রতিবাবের মত এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাধারণ সভায় একটি কমিটি গঠন করা হয় এই পূজাকমিটির সভাপতি পদে মাননীয় শ্রী অশোক কুমার আর্য্যকে মনোনীত করা হয়, এবং শ্রী জহরলাল দেকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সকল সদস্যর কাছে সর্বাঙ্গীন সহায়তার অনুরোধ রাখা হয়, এই বিরাট উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে যেমন বিশাল অর্থের প্রয়োজন হয়, তেমনি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্যও জনবলের দরকার হয়। আমরা আশাকরি সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের মন্দিরপ্রাঙ্গণে সকল ভক্তবৃন্দকে জমায়েত করতে পারব।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর প্রতিবারের মত জন্মাষ্টমী উৎসব আমাদের মন্দিরে প্রতিপালিত হল। সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ এক বিশেষ আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়, ফুলের স্তবকে সাজানো এক বিশেষ ঝুলায় রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ সাজানো হয়। রাত্রে কীর্ত্তনগানের অনুষ্ঠান রাখা হয়। মধ্যরাত্রি অবধি প্রচুর ভক্তালু সমুদায়ের সমাগম হয় এবং বিশেষ পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা করা হয় পূজা সমাপনান্তে ভোগের ব্যবস্থা রাখা হয়।

আমাদের পরবর্তী কার্য্যক্রম দুর্গাপূজা। আসুন আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই বিশাল উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করি।

আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি শ্রী পি. কে. বেরা কে যিনি আমাদের এই সংখ্যার প্রচ্ছদপট এবদান করেছেন । শ্রী বেরা নয়ডারই একজনপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী এবং আমাদের সংঘের একজন সদস্য ।

সম্পাদক

অলস নয়নী
পেন্সিল স্কেচ - তপন চ্যাটার্জী, মহীশূর

সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী বন্ধুরা নীচের ঠিকানায় লেখাপাঠান:

সম্পাদক
সমন্বয়
নয়ডা বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন
ই৫ সি, কালীবাড়ী মার্গ, সেক্টর ২৬
নয়ডা ২০১৩০১
ফোন ০১২০- ২৫২২৮৩৬ / ৪৫৪৭৩৭৫

সংঘের মন্দিরপ্রাঙ্গণে ১৫ই অগাস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন
সংঘের সাধারন সম্পাদক শ্রী অমিয় দাস

১৫ই অগাস্ট সংঘের প্রাঙ্গণে নৃত্য পরিবেশন করছেন
সায়ন্তনী নৃত্য শিক্ষায়তনের শিশু শিল্পীরা

১৫ই অগাস্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকার উপর
বিপ্লব দাশগুপ্তের নিবন্ধটি পাঠ করছেন শ্রী কৌশিক চ্যাটার্জী

সংঘের তরফ থেকে গরীব মহিলাদের বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠান

Published by Amiya Das, Secretary,Noida Bengali Cultural Association and printed by Delhi Paper Products.